CC:-1

প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের উপাদান

কালের অমোঘ নিয়মে ইতিহাসের সকল বস্তুই বিবর্তনশীল। এই বিবর্তনশীল ইতিহাসের রথচক্র দুর্বার গতিতে সম্মুখপানে ছুটে চলেছে। স্মরণাতীত কাল ধরে যুগের পর যুগ, শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে বিবর্তিত কালের কথা জানতে আমাদের অনুসন্ধিৎসু মন অতীতের ফেলে আসা উপাদানের মাধ্যমে মানব সভ্যতার অগ্রগতির ধারা অনুসন্ধান করে চলেছে।কিন্তু প্রাচীন ভারতের ইতিহাস রচনার একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবন্ধকতা হল তথ্যের অপ্রতুলতা। প্রাচীন ভারতীয়রা জ্ঞান-বিজ্ঞানের নানা শাখায় অসামান্য সাফল্যের পরিচয় দিলেও প্রাচীন ভারতে কিন্তু কোনো ইতিহাস গ্রন্থ রচিত হয়নি। তবে ইতিহাস রচনার কাজে ভারতীয়দের অনাগ্রহ ছিল, এমন অভিযোগ সঠিক নয়। R.C.Majumdar এর মতে "প্রাচীন ভারতে ইতিহাস চেতনার অভাব ছিল না তবে কালানুক্রমিক ও বিশ্লেষনমূলক সাহিত্যের অভাব ছিল। "এই কারণে বিভিন্ন প্রাচীন নিদর্শন বা উপাদানের উপর ভিত্তি করে প্রাচীন ভারতের ইতিহাস রচনা করা হয়।

প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের উপাদান গুলিকে মূলত দুটি ভাগে বিভক্ত করা যায়- (ক)সাহিত্যিক উপাদান, (খ)প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদান। সাহিত্যিক উপাদানকে আবার দুটি ভাগে ভাগ করা যায়- ১.)ভারতীয় সাহিত্য, ২.)বিদেশি সাহিত্য। অনুরূপভাবে প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদান গুলিও লিপি, মুদ্রা,স্থাপত্য-ভাস্কর্য-চিত্রকলা প্রভৃতি ভাগে বিভক্ত।

আমরা এখানে আলোচনার শুরুতে প্রথমে সাহিত্যিক উপাদান গুলি নিয়ে আলোচনা করবো। আগেই বলা হয়েছে যে সাহিত্যিক উপাদানগুলি দুটি ভাগে বিভক্ত ছিল- ১.)দেশজ সাহিত্য, ২.)বৈদেশিক সাহিত্য। দেশজ সাহিত্যের আলোচনার ক্ষেত্রে প্রথমেই বলা যায় যে এই অংশে সাহিত্য, ধর্মশাস্ত্র, মহাকাব্য, জীবনীসাহিত্য, পুরান ইত্যাদি ছিল বিশেষ ভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

ঋক বৈদিক যুগ থেকে পৌরাণিক যুগ পর্যন্ত ভারতের ইতিহাস রচনার জন্য ভারতীয় ধর্মগ্রন্থ ও ধর্মনিরপেক্ষ রচনাগুলি গুরুত্বপূর্ণ।উল্লেখযোগ্য ধর্মগ্রন্থগুলি হল-বেদ, রামায়ণ, মহাভারত, পুরান সমগ্র ইত্যাদি।এগুলি থেকে বৈদিক

ও পরবর্তী বৈদিক যুগের আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয় জীবন সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। ঋকবেদ প্রাচীনতম গ্রন্থ এবং আদি বৈদিক যুগের (খ্রিস্টপূর্ব ১৫০০-১০০০)প্রধানতম তথ্যসূত্র।প্রতিটি বেদের মধ্যে সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদ এই চারটি অংশ আছে। অবশ্য প্রতিটি অংশ একসাথে লেখা হয়নি। এগুলি থেকে আর্য - অনার্য সংস্কৃতির সংমিশ্রনের আভাষ পাওয়া যায়।চতুর্বেদ ছাড়াও বেদাঙ্গ,ধর্মসূত্র বৈদিক সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত। এগুলিতে মূলত পরবর্তী বৈদিক যুগের ঘটনা বিন্যাস পাওয়া যায়।এছাড়া উপনিষদের দার্শনিক চিন্তাধারাকে ভিত্তি করে রচিত হয়েছে ষড়দর্শন। এটিও ভারতের জীবনবোধের ধারণা দেয়।

প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসের দুটি গুরুত্বপূর্ণ আকরগ্রন্থ হল রামায়ণ ও মহাভারত।আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতক থেকে খ্রিষ্টীয় চতুর্থ শতকের মধ্যে এগুলি রচনা সম্পূর্ণ হয়েছে।মহাভারত রচনা শুরু হয়েছিল আগে এবং শেষ হয়েছিল পরে। দুইটি মহাকাব্যই মূলত ক্ষত্রিয় বিরগাঁথা। রামায়ণ থেকে আর্য-অনার্য দ্বন্দ্ব প্রতিফলিত হয়।মহাভারতের যুগে আর্য সংস্কৃতির বিকাশ এবং কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পর ঐক্যবদ্ধ রাষ্ট্রগঠনের প্রয়াস সম্পর্কে অভাস পাওয়া যায়। মহাকাব্য দুই এর প্রাচীন গুরুত্ব হল এগুলি থেকে ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতির পরিবর্তনশীল চরিত্রের সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়।

মহাকাব্যের সমকালীন প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের সূত্র হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ হল পুরান। পুরানের অর্থ পুরা কাহিনী, পুরাবৃত্ত।পুরান অনেক গুলি আছে তার মধ্যে ১৮ টি পুরান হল প্রধান। R. C. Hazra এর মতে, "প্রাচীন ভারতের ইতিহাস রচনায় দ্বিধাহীন ভাবে পুরানের সাহায্য নেওয়া যেতে পারে"কিন্তু H. C. RoyChowdhury এর মতে,পুরানের বর্ণনায় বহুক্ষেত্রে ভৌগোলিক বাস্তবতার পরিবর্তে কবির কল্পনা প্রাধান্য পেয়েছে। বস্তুত পুরানে কিংবাদন্তী ও ঐতিহাসিক সূত্র এমনভাবে মিশে আছে যে সতর্কতার সাথে তা গ্রহণ করা আবশ্যিক।

প্রাচীন ভারতের ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে বৌদ্ধ ও জৈন সাহিত্যের একবিশেষ ভূমিকা আছে। প্রাচীন বৌদ্ধগ্রন্থ গুলি স্থানীয় মানুষের কথ্যভাষা পালিতে লিখিত।খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম-দ্বিতীয় অব্দের মধ্যবর্তীকালের উপাদান হিসেবে জাতক গ্রন্থগুলি গুরুত্বপূর্ণ। মূল বৌদ্ধগ্রন্থ ত্রিপিটক ছাড়া সিংহলীয় বৌদ্ধ সাহিত্য দীপবংশ, মহাবংশ থেকে বুদ্ধের জীবনী ও মৌর্য শাসনকালের কিছু তথ্য পাওয়া যায়। জৈন গ্রন্থ জৈন ভগবতীসুত্র থেকে খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকের রাজনৈতিক ইতিহাস যেমন ষোড়শ

মহাজনপদের সময়কাল সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। একই ভাবে জৈনপরিশিষ্টপার্বন, প্রবন্ধচিন্তামণি ইত্যাদি থেকে ইতিহাসের সূত্র পাওয়া যায়।

ধর্মনিরপেক্ষ সাহিত্য হিসেবে বিভিন্ন ধর্মসূত্র, স্মৃতিশাস্ত্র, অর্থশাস্ত্র প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ। স্মৃতিশাস্ত্র গুলির মধ্যে আছে নারদ, যাজ্ঞবল্ক্য, মনু, বৃহস্পতি প্রমুখ স্মৃতিশাস্ত্র গুলি গুরুত্বপূর্ণ। এগুলি থেকে দন্ডনীতি ও উত্তরাধিকার সম্পর্কে জানা যায়।এছাড়া বাৎসায়নের কামসূত্র, কামন্দকের নীতিসার, পতঞ্জলির মহাভাষ্য ঐতিহাসিক রচনা হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ।

শুধু সংস্কৃত, পালি ও প্রাকৃত নয়,তামিল ভাষায়ও প্রাচীন ভারতে বহু গ্রন্থ রচিত হয়েছিল। এই ধরণের কয়েকখানি আদি গ্রন্থ নিয়েই সঙ্গম সাহিত্য।সঙ্গম সাহিত্যের কাল সম্পর্কে পন্ডিত মহলে বাগ-বিতন্ডা আছে।তবে তামিলনাড়ুর রাজনৈতিক, সামাজিক, ও অর্থনৈতিক ইতিহাসের এক অমূল্য উপাদান এই সঙ্গম সাহিত্যে ছড়িয়ে আছে। সঙ্গম সাহিত্যে তামিলনাড়ুর বাণিজ্যিক সমৃদ্ধির যে ছবি আছে, প্রত্নতাত্বিক নিদর্শনে তার অভাস আছে।

সঙ্গম সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত নয় অথচ প্রাচীন তামিল ভাষায় লেখা কয়েকটি তামিল মহাকাব্যও আছে। "শিলপ্পদিকারম"ও "মণিমেকলৈ"তামিল ভাষায় লেখা দু'খানি শ্রেষ্ঠ মহাকাব্য। প্রাচীন গ্রিক সাহিত্যে যেমন ইলিয়াড ও ওডিসি, তেমনি প্রাচীন তামিল সাহিত্যে "শিলপ্পদিকারম"ও "মণিমেকলৈ"।

গুপ্ত ও গুপ্তপরবর্তী যুগের লিখিত উপাদানগুলিকে দুভাবে ভাগ করা যায়-

১.)জীবনী সাহিত্য,

২.)স্থানীয় ঘটনাপঞ্জি।

জীবনী সাহিত্যের মধ্যে বানভটের "হর্ষচরিত",বিশাখদত্তের "মুদ্রারাক্ষস", বিলহনের "বিক্রমাঙ্কদেবচরিত", সন্ধ্যাকর নন্দীর"রামচরিত" প্রভৃতি স্মরণীয়। হর্ষচরিত থেকে পুষ্যভূতি বংশের এবং বিশেষত হর্ষবর্ধনের রাজত্ব কাল সম্পর্কে জানা যায়। রামচরিত গ্রন্থ পাল বংশের শেষ শক্তিশালী শাসক রামপাল এবং অন্য অর্থে অযোদ্ধার রামচন্দ্রর জীবন ও কৃতিত্বের সূত্র হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ। ইতিহাস আশ্রয়ী রচনার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন অবশ্যই কলহন রচিত রাজতরঙ্গিনী। দ্বাদশ শতকে রচিত এই

গ্রন্থ অষ্টম শতক ও তার পূর্ববর্তী সময়ের কাশ্মীরের একটি তথ্য নিষ্ঠ উপাদান। গুজরাট, নেপাল প্রভৃতি অঞ্চলের ইতিহাস রচনার কাজেও এটি সাহায্য করে।

প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের উপাদান রূপে বিদেশি সাহিত্যেরও এক বিশেষ ভূমিকা আছে। দেশ ভ্রমণের ইচ্ছা, ধর্মীয় প্রেরণা বা বাণিজ্যিক কারণে গ্রিস, পারস্য, চিন, প্রভৃতি দেশ থেকে অনেকেই ভারতে এসেছিলেন। ভারতে তাদের অভিজ্ঞতালব্ধ বিবরণ গুলি থেকে ভারত ইতিহাসের বহু সূত্র পাওয়া যায়।যে সব বিদেশী দের রচনা প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের ওপর আলোকপাত করে তাঁদের মধ্যে গ্রিক ঐতিহাসিক হেরোডোটাস সবচেয়ে প্রাচীন।আর একজন প্রাচীন গ্রিক ঐতিহাসিক টিসিয়াস। এরা কেউই ভারতে আসেননি, ভারত সম্পর্কে যা কিছু জানার তা তাঁরা অন্যের মুখ থেকে শুনেছেন।তুলনায় নিয়ারকাস এবং মেগাস্থিনিসের বিবরণ অনেক বাস্তব।এরপাশাপাশি অ্যারিষ্টোবুলাস, কার্টিয়াস প্রমূখের বিবরণ ও বিশেষ ভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

গ্রিক পর্যটক ও রাজপ্রতিনিধি মেগাস্থিনিসের ইন্ডিকা গ্রন্থ থেকে মৌর্য ও মৌর্যত্তর ভারতের বহু তথ্য জানা যায়। এছাড়া গ্রিক লেখক টলেমির ভূগোল গ্রন্থ সমকালীন ভারতের সামুদ্রিক ক্রিয়াকলাপ ও বাণিজ্যিক যোগাযোগের নানা তথ্য দেয়। প্লিনি রচিত "Natural History"গ্রন্থ থেকে ভারতের জীবজন্তু, লতাগুল্ম ও খনিজ সম্পদের বিবরণ পাওয়া যায়। রোম সাম্রাজ্যের সঙ্গে ভারতের বাণিজ্য বোঝার জন্য অপরিহার্য উপাদান হল প্রথম শতকে রচিত অজ্ঞাতনামা গ্রিক নাবিকের গ্রন্থ "Periplus Of the Erythrian Sea"। ষষ্ঠ শতকের শেষ দিকে সিরিয়ার কসমাস ইন্ডিকো প্লয়েস্টেস ভারত ও শ্রীলংকা সম্পর্কে "Christian Topography" গ্রন্থে তাঁর ধারনা লিপিবদ্ধ করেছেন।

প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের উপাদান হিসেবে চৈনিক পর্যটকদের বিবরণও গুরুত্বপূর্ণ। গুপ্ত ও গুপ্তপরবর্তী যুগের ইতিহাসের জন্য এদের বিবরণ সহায়ক এই বিচারে ফা-হিয়েন,হিউ-এন-সাঙ প্রমূখের বিবরণ গুরুত্বপূর্ণ। এদের বিবরণ থেকে সমকালীন ভারতীয় রাজনীতি, অর্থনীতি, ধর্ম-সংস্কৃতি বিষয়ে জানা যায়। নবম শতকের মধ্যেভাগ থেকে আরবি, ফার্সি রচনায় ভারতের প্রসঙ্গ স্থান পায়। এই রচনাগুলির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল এখানে উল্লেখিত সন-তারিখ সম্পর্কে বিশেষ দ্বিমত নেই।আল্ বিলাদুরির রচনায় আরবদের সিন্ধু আক্রমণ সম্পর্কে জানা যায়। ভারতের সঙ্গে এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চল এবং ভুমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের স্থলপথ ও সমুদ্রপথে

বাণিজ্যর ইতিহাস জানার জন্য আরবিয়দের বিবরণ গুরুত্বপূর্ণ। সুলেমান, আলমাসুদি প্রমূখের ভারত সংক্রান্ত বৃত্তান্ত বিশেষ উপযোগী। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, বহু আরব লেখকই ভারতে না এসেও পর্যটকদের বা ব্যবসায়ীদের কথার ভিত্তিতে বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন। তাই এদের বর্ণনা সম্পূর্ণ ত্রুটিমুক্ত নয়। তাছাড়া ভারতীয় ভাষা, সামাজিক আচার অনুষ্ঠান, ধর্মবিশ্বাস ইত্যাদি সম্পর্কে তাঁদের অজ্ঞতা অনেক ক্ষেত্রেই ইতিহাস রচনার কাজ কে বিঘ্নিত করেছে। তাই ইতিহাসের সূত্র হিসেবে বিদেশী দের বিবরণ গ্রহণের ক্ষেত্রেও যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন জরুরি। সীমাবদ্ধতা সত্বেও আবেগ বর্জিত ও যুক্তিবাদী মন নিয়ে অনুসন্ধান করলে প্রাচীন সাহিত্য থেকেও ইতিহাসের উপাদান পাওয়া সম্ভব।

এবার আমরা দেখব প্রাচীন ভারতের ইতিহাস রচনায় প্রত্নতাত্বিক উপাদান কতটা গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমেই বলা যায় যে সাহিত্যিক উপাদানের চেয়ে প্রত্নতাত্বিক উপাদান অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ।খননকার্য চালনা করে মাটির তলা থেকে অতীত দিনের তৈরী বা অতীতে ব্যবহার করা যেসব জিনিস পত্র আবিষ্কৃত হয় তাই প্রত্নতাত্বিক উপাদান। লেখমালা, মুদ্রা, স্থাপত্য, ভাস্কর্য, মাটি, পাথর ও ধাতুর তৈরী জিনিস এবং আরো অনেক কিছু প্রত্নতাত্বিক উপাদানের মধ্যে পড়ে। এগুলি যে সবসময় মাটির তলা থেকেই পাওয়া যায় তা নয়, মাটির ওপরেও দেখা যায়। এই সব প্রত্নসামগ্রীর মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে প্রাচীন ভারতের রাজনৈতিক, আর্থ-সামাজিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক জীবনের পরিচয়।

প্রত্নতাত্বিক উপাদানগুলিকে আবার কয়েকটি শাখায় বিভক্ত করা যায়। যেমন:-লিপি বা লেখমালা, মুদ্রা,স্থাপত্য–ভাস্কর্য–চিত্রকলা প্রভৃতি।প্রথমে আমরা আলোচনা করবো লিপি বা লেখমালা সম্পর্কে।

প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসের উপাদান হিসেবে লেখমালার তাৎপর্য অপরিসীম।ভারতে লিপি উৎকীর্ণ করার প্রাচীনতম নজির সম্ভবত হরপ্পা সভ্যতায় দেখা যায়। তবে হরপ্পা লিপির গ্রহণযোগ্য পাঠদ্ধার এখন ও পর্যন্ত সম্ভব হয়নি। পাঠদ্ধার করা লেখগুলির মধ্যে প্রাচীনতম হল অশোকের লেখমালা। এগুলি প্রাকৃত ভাষায় এবং মূলত ব্রাহ্মী লিপিতে উৎকীর্ণ। অশোকের সামান্য কিছু লেখমালায় খরোষ্ঠী, আরমাইক, গ্রিক লিপি ব্যবহৃত হয়েছে। এই সব লেখ রাজআজ্ঞা হিসেবে প্রচারিত। সামাজিক ইতিহাসের ক্ষেত্রেও অশোকের লিপিগুলি গুরুত্বপূর্ণ।অশোকের ধর্মীয় লেখগুলি থেকে প্রশাসনিক তথ্য পাওয়া যায়। যেমন :-একটি লেখ তে বলা

হয়েছে অশোক, গৌতম বুদ্ধের জন্মস্থান লুম্বিনী গ্রামের কর হ্রাস করে ৮% ধার্য করেন। এর থেকে অনুমিত হয় যে, ইতিপূর্বে সেখানে আরো বেশি করভার ছিল।Dr.R.S.Sharma এর মতে,অশোকের স্তম্ভলিপি গুলি মূলত গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যপথের ওপর প্রথিত ছিল। এ থেকে বোঝা যায় যে, তিনি বাণিজ্যে উৎসাহী ছিলেন।

মৌর্যত্তর ও গুপ্তযুগের লেখগুলি বেসরকারি ও সরকারি-এই দুই ভাগে বিভক্ত। বেসরকারী বা ব্যক্তিগত লেখগুলির অধিকাংশই ছিল দানপত্র। মৌর্য পরবর্তী কালে গয়া, সাঁচি, নাসিক, ও মথুরা অঞ্চলে এমন কিছু লেখ আবিষ্কৃত হয়েছে যেখানে বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মকে দান-প্রদানকারী ব্যক্তিদের নাম লিপিবদ্ধ আছে। সাতবাহনদের লেখ গুলি থেকে সমকালের গুরুত্বপূর্ণ নগর, বন্দর, শিল্পী সমবায় প্রভৃতির নাম জানা যায়। মৌর্যত্তর লেখগুলি বিভিন্ন বৃত্তি সম্পর্কে ধারণা দেয়, অনুমিত হয় তৎকালীন সমাজে বণিক ও শ্রমজীবীদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল।

সমকালীন অন্যন্য লেখগুলির মধ্যে সাতবাহনরাজ গৌতমীপুত্র সাতকর্নির "নাসিক প্রশস্তি", কলিঙ্গরাজ খারবেল এর "হস্তীগুম্ফা লিপি", সমুদ্রগুপ্তের সভাকবি হরিসেন এর "এলাহাবাদ প্রশস্তি" ইত্যাদি ইতিহাসের উপাদান হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ। সাতবাহন লেখতে রাজার নামের অঙ্গ হিসেবে রাজমাতার নামের সংযোজন নারী প্রাধান্যের পরিচয় দেয়। হরিসেন এর এলাহাবাদ প্রশস্তি গুপ্তযুগের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে স্বীকৃত। পরবর্তী যুগের ভূমি ব্যবস্থার রূপান্তর অর্থাৎ ভূমিদান এবং সামন্ততান্ত্রিক উপাদানের আবির্ভাব বিষয়ক তথ্য মূলত লিপির সাক্ষ্য থেকেই পাওয়া যায়।

এবার মুদ্রার ক্ষেত্রে বলা যায় যে, প্রাচীন ভারতের ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে মুদ্রার ভূমিকা অপরিসীম। অনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ৫০০ অব্দে ধাতু নির্মিত মুদ্রা চালু হয়। এগুলিকে "অঙ্কচিহ্নিত"মুদ্রা বলা হয়। রৌপ্য নির্মিত মুদ্রাগুলি প্রাক-মৌর্য ও মৌর্যত্তর কালে আনুমানিক খ্রীষ্টিয় প্রথম শতক পর্যন্ত পাওয়া যায়।মৌর্যত্তর কালে সর্বাধিক মুদ্রা পাওয়া যায়। সম্ভবত কুষান রাজারা ভারতে ব্যাপক ভাবে স্বর্ণমুদ্রা চালু করেন। মুদ্রাগুলি উন্নতমান থেকে অনুমিত হয় যে সাতবাহন ও কুষান যুগে ভারতে সমৃদ্ধ বাণিজ্যর প্রচলন ছিল। সাতবাহনদের কিছু মুদ্রায় জাহাজের চিত্রকল্প থেকে সমুদ্রবানিজ্যের ইঙ্গিত মেলে। মুদ্রার সাক্ষ্য থেকেই জানা যায় যে মৌর্য্যত্তর যুগ থেকে গুপ্তযুগের সূচনা পর্যন্ত ব্যবসা বাণিজ্যর স্বচ্ছলতা ছিল এবং নগরায়ণ দ্রুততর হয়েছিল।

গুপ্ত পরবর্তীযুগে মুদ্রার সংকোচন দেখা যায়।৬৫০-১০০০ খ্রিস্টাব্দের অন্তবর্তীকালে স্বর্ণমুদ্রা প্রায় লোপ পায়।এমনকি তামা, সীসা, টিন, কাসা ইত্যাদি ধাতব মুদ্রার সংখ্যাও হ্রাস পায়। বাংলাদেশ, কাশ্মীর,পাঞ্জাবের কিছু রাজবংশকে বাদ দিলে মুদ্রার সাক্ষ্যর সাথে অন্যান্য রাজবংশকে যুক্ত করা যায় না। মুদ্রার অভাব একই সাথে বাণিজ্যর অবনতি ও বিনগরায়নের সম্ভবনা স্পষ্ট করে। মুদ্রার বিশ্লেষণ থেকে সমকালীন শাসক ও মানুষের জীবন ধারা, সামাজিক রীতি ও ধর্মবিশ্বাসের আভাস পাওয়া যায়। সমুদ্রগুপ্তের বীনাবাদনরত মূর্তি থেকে তাঁর সংগীতানুরাগের আভাস মেলে। কিংবা কুষানদের মুদ্রায় শিব ও বিষ্ণুর মূর্তি থেকে এই দুই ধর্মের প্রতি তাদের অনুগত্যের পরিচয় পাওয়া যায়। মুদ্রার আকৃতি, ধাতু, বৈশিষ্ট্য, খাদের পরিমান ইত্যাদি সমকালীন যুগের আর্থিক স্বচ্ছলতা বা দুর্বলতার নিদর্শন রূপে গুরুত্বপূর্ণ।

উৎখননের ফলে যে শুধু লেখ বা মুদ্রা আবিষ্কৃত হয়েছে তা নয়, পুরোনো যুগের আবাস, মন্দির, স্তুপ, বিহার, ধাতুর মূর্তি, পোড়ামাটির কাজ, ধাতু, পাথর ও পুঁতির গয়না, বিভিন্ন ধরণ ও আকারের মাটির পাত্র ইত্যাদি নানা জিনিসপত্রও পাওয়া গেছে। এইসব জিনিস থেকে হয়তো রাজনৈতিক ইতিহাসের বিশেষ কিছু জানা যায় না কিন্তু শিল্প সংস্কৃতির বিবর্তনের ইতিহাসে এদের গুরুত্ব অপরিসীম। প্রাচীন ভারতের শিল্প সাধনা ও ধর্মীয় জীবনের বিবর্তনের স্বরূপ অবগতির জন্য স্থাপত্য,চিত্রকলা ও ভাস্কর্যের প্রাচীন নিদর্শনের কোনো বিকল্প নেই। এই সব নিদর্শনের মধ্যে দিয়ে পরোক্ষভাবে দেশের আর্থ-সামাজিক চিত্রটি প্রস্ফুটিত হয়েছে।তক্ষশিলা, সারনাথ, পাটলিপুত্র, কৌশাম্বী, হস্তীনাপুর প্রভৃতি স্থানে খনন কার্য চালিয়ে প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের অনেক গৌরবময় অধ্যায় আবিষ্কৃত হয়েছে। ভারতের বাইরে বেলুচিস্থান ও তুর্কিস্থানে খননকার্যের ফলে ওইসব অঞ্চলের সঙ্গে ভারতের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের কথা জানা যায়। কম্বোজের আঙ্কোরভাট ও জাভার বরোবুদুরের মন্দির দুটি ভারতের ঔপনিবেশিক ও সাংস্কৃতিক বিস্তারের সাক্ষ্য বহন করে।

পরিশেষে বলা যায় যে,প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের উপাদান হিসেবে সাহিত্যিক উপাদান এবং প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদান উভয়ের ভূমিকাই গুরুত্বপূর্ণ। সাহিত্যিক উপাদানের ক্ষেত্রে কিছু জিনিস অতিরঞ্জিত করার সম্ভবনা দেখা গেলেও প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদানের ক্ষেত্রে এই রকম কোনো সুযোগ নেই।কিন্তু সব দিক বিচার

বিবেচনা করে বলা যায় যে প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের ক্ষেত্রে এই দুটি উপাদানের ভূমিকাই যে অনস্বীকার্য তা বলাইবাহুল্য।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

১.)Singh, Upinder, A History Of Ancient and Early Medieval India

২.)চক্রবর্তী, রনবীর, ভারত ইতিহাসের আদিপর্ব(প্রথম খন্ড)

৩.)মুখোপাধ্যায়, জীবন, স্বদেশ সভ্যতা ও বিশ্ব

৪.)গঙ্গোপাধ্যায়, দিলীপ, ভারত ইতিহাসের সন্ধানে (প্রথম খন্ড)

By:-Eliza Roy